ছন্দের প্রয়োজনীয়তা

ছন্দ কবিতা, ছড়া, গান, আবৃত্তি ও কাব্যভাষার অন্যতম মৌলিক উপাদান। ছন্দ ছাড়া কবিতা একেবারে অসম্ভব– এ কথা বলা যায় না; কিন্তু ছন্দ ছাড়া কবিতার ধ্বনিগত সংগঠন, স্মরণযোগ্যতা ও আবেগের সুষমা অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। ছন্দ ভাষাকে মাপা করে, রসকে ঘনীভূত করে, ভাবকে গতি দেয় এবং উচ্চারণকে শ্রুতিমধুর করে।

১. রসাস্বাদনে ছন্দের ভূমিকা: মানুষের মনে রস আস্বাদনের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কবিতার ছন্দ সেই রসগ্রহণকে পরিমিত, পরিশুদ্ধ ও গভীর করে। শব্দ যখন ছন্দে বাঁধা পড়ে, তখন তা কেবল তথ্য বহন করে না; অনুভূতি বহন করে। একই কথা গদ্যে বলা হলে যে প্রভাব হয়, ছন্দে বললে অনেক সময় তা বেশি স্মরণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

২. ধ্বনিগত সংগীত মাধুর্য: ছন্দ শব্দকে সংগীতের কাছাকাছি নিয়ে যায়। গান, ছড়া, কবিতা– সব ক্ষেত্রেই ছন্দ ধ্বনিগত তরঙ্গ তৈরি করে। এই তরঙ্গই শ্রোতার কানে মাধুর্য সৃষ্টি করে।

৩. ভাবকে নিয়ন্ত্রণ: অতিরিক্ত আবেগ ভাষাকে এলোমেলো করে দিতে পারে। ছন্দ সেই আবেগকে পরিমিত রূপ দেয়। যেমন নদীর জল বাঁধ পেলে সুশৃঙ্খল প্রবাহ পায়, তেমনি কবির আবেগ ছন্দের ভিতরে সংগঠিত হলে কাব্যরূপ লাভ করে।

৪. স্মরণযোগ্যতা: লোকছড়া, প্রবাদ, শিশুতোষ কবিতা, গান– এসব এত সহজে মনে থাকে কারণ এগুলোর মধ্যে ছন্দ আছে। ছন্দ স্মৃতিকে সাহায্য করে। মাপা ধ্বনি মানুষের মনে দ্রুত বসে যায়।

৫. আবৃত্তিযোগ্যতা: কবিতার আবৃত্তিতে ছন্দ অপরিহার্য। কোথায় থামতে হবে, কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় গতি বাড়বে বা কমবে–এসব ছন্দের মধ্যেই নিহিত থাকে।

৬. বাংলা ভাষায় ছন্দের বিশেষ প্রয়োজন:

বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের মতো কঠোর হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, আবার ইংরেজির মতো শক্তিশালী প্রস্বর (stren) ব্যবস্থাও নেই। তাই বাংলা কবিতায় ধ্বনির পরিমিতি, যতি, মাত্রা ও পর্ববিন্যাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছন্দ বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসকে সংযত করে এবং কাব্যভাষাকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে।[৮]

ন্দ-সন্ধি ও ছন্দ-সমাস

কবিতার উচ্চারণে অনেক সময় শব্দের স্বাভাবিক রূপ সামান্য সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। কখনো দুটি শব্দ উচ্চারণে কাছাকাছি এসে ধ্বনিগত মিলন তৈরি করে; কখনো কোনো ধ্বনি উচ্চারণে লোপ পায় বা যুক্ত হয়। এই ছন্দগত প্রয়োজন থেকে ছন্দ-সন্ধি ও ছন্দ-সমাসের আলোচনা আসে।

১. ছন্দ–সন্ধি: ছন্দ রক্ষার জন্য উচ্চারণে ধ্বনির মিলন বা সংক্ষেপ ঘটলে তাকে ছন্দ-সন্ধি বলা হয়। এটি লিখিত সন্ধির চেয়ে আলাদা– এটি শুধু উচ্চারণে ঘটে।

উদাহরণ ১: দুই শব্দ এক উচ্চারণে:

লেখা: ‘হয়ে আছে’ উচ্চারণে: ‘হয়েছে’ (২ মাত্রা)
লেখা: ‘করি আছি’ উচ্চারণে: ‘করেছি’ (৩ মাত্রা)
লেখা: ‘কে আছে’ উচ্চারণে: ‘কেছে’ / ‘কেচে’ (২ মাত্রা)

উদাহরণ ২: কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পয়োগ:

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে?

বিশ্লেষণ:

– ‘উঠেছে’ = ‘উঠিয়া আছে’-র ছন্দ-সংকোচন
– ‘ফুটেছে’ = ‘ফুটিয়া আছে’-র সংকুচিত রূপ
– স্বরবৃত্তের ৪ মাত্রা পর্ব রক্ষা করতেই এই সংকোচন

২. ছন্দ-সমাস: কবিতার প্রবাহে দুটি বা ততোধিক শব্দ ছন্দগতভাবে একত্রে ধ্বনিত হলে তাকে ছন্দ-সমাসের আলোচনায় আনা হয়। এটি ব্যাকরণের সমাসের মতো শব্দ-গঠন নয়; এটি ছন্দে শব্দ-ধ্বনির সমন্বয়।

উদাহরণ: নীল-নীলিমা / কুসুম-কোমল / মেঘের কোলে / চাঁদ

বিশ্লেষণ:

– ‘নীল-নীলিমা’: দুই শব্দ এক পর্বে – ৪ মাত্রা
– ‘কুসুম-কোমল’: দুই শব্দ এক পর্বে – ৪ মাত্রা
– লিখিত ভাষায় এগুলো আলাদা শব্দ, ছন্দে একত্রে ধ্বনিত
– হাইফেন (-) ছন্দ-সমাসের চিহ্ন হিসেবে কাজ করে

NABARUN PUBLICATION

আরেকটি উদাহরণ:

ধান-ভানা শালিকেরা / উঠানে নেমেছে

বিশ্লেষণ:

– 'ধান-ভানা' একটি ছন্দ-সমাস

– দুই শব্দ ছন্দে এক একক হিসেবে কাজ করছে

– পর্বের মাত্রা: ৪

৩. লিখিত সন্ধি-সমাসের সঙ্গে পার্থক্য

ছন্দ-সন্ধি ও ছন্দ-সমাস মূলত ছন্দের উচ্চারণভিত্তিক বিষয়। লিখিত ব্যাকরণের সন্ধি-সমাসের সঙ্গে এদের সম্পর্ক থাকলেও পুরোপুরি এক নয়।

বিষয়	লিখিত সন্ধি-সমাস	ছন্দ-সন্ধি-সমাস
ক্ষেত্র	ব্যাকরণ, শব্দগঠন	ছন্দ, উচ্চারণ
নিয়ম	নিয়মবদ্ধ ও স্থায়ী	ছন্দনির্ভর ও পরিবর্তনশীল
প্রয়োগ	লেখায় ও পঠনে উভয়	মূলত আবৃত্তিতে

ছন্দ বাংলা কাব্যভাষার ধ্বনিগত সুষমা। এর ব্যুৎপত্তিতেই আনন্দ ও আহ্লাদের ধারণা আছে। ছন্দ শব্দকে সংগঠিত করে, উচ্চারণকে মধুর করে, ভাবকে গতি দেয়, রসকে ঘনীভূত করে এবং কবিতাকে স্মরণযোগ্য করে। ছন্দের মূল উপাদান বর্ণ নয়, ধ্বনি; আর ধ্বনির বিশ্লেষণে অক্ষর বা দল, মুক্তদল, রুদ্ধদল, মাত্রা, যতি, পর্ব, চরণ, পঙ্‌ক্তি ও স্তবকের ধারণা অপরিহার্য। ছন্দ বোঝার প্রথম শর্ত হলো– লিখিত শব্দের বাইরে গিয়ে উচ্চারিত ধ্বনিকে শুনতে শেখা।

প্রথম পর্বে আমরা ছন্দের ভিত্তি নির্মাণ করলাম। দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হবে বাংলা ছন্দের ইতিহাস, পয়ার-লাচাড়ি-ধামালি, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অমিত্রাক্ষর, মুক্তক, গদ্যছন্দ ও সনেটের বিবর্তন।

বাংলা ছন্দের ইতিহাস, শ্রেণিবিভাগ ও প্রধান রূপ

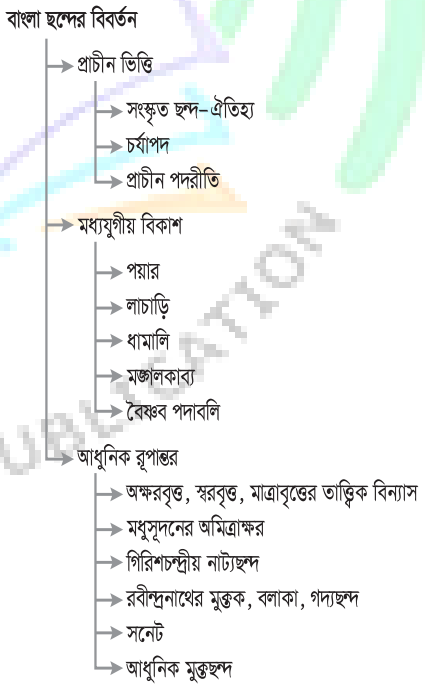

এখন আমরা বাংলা ছন্দের ঐতিহাসিক বিবতন ও পধান শেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। বাংলা ছন্দ কোনো বিচ্ছিন ঘটনা নয়; এটি ভারতীয় ছন্দ-ঐতিহ্য, লোককবিতা, চযাপদ, মধ্যযুগীয় পুঁথি, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, পয়ার-রীতি, ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর, রবীন্দনাথের মুক্তক ও গদ্যছন্দ, এবং আধুনিক কবিতার ছন্দ-স্াধীনতার মধ্য দিয়ে ক্রমে গড়ে উঠেছে।

বাংলা ছন্দের ইতিহাস তাই তিনভাবে দেখা যায়– (ডানের রেখাচিত্রটি দেখি)

এই আলোচনায় মনে রাখতে হবে, বাংলা ছন্দের নামকরণে ছান্দসিকদের মধ্যে ভিন্নতা আছে। কেউ অক্ষরবৃত্তকে মিশ্রবৃত্ত বলেছেন, কেউ স্বরবৃত্তকে দলবৃত্ত বা বলবৃত্ত বলেছেন, কেউ মাত্রাবৃত্তকে কলাবৃত্ত বলেছেন। পরিভাষার এই বৈচিত্র্য বাংলা ছন্দচিন্তার ইতিহাসকে জটিল করলেও সমৃদ্ধ করেছে।

ভারতীয় ছন্দ-ঐতিহ্য ও বাংলা ছন্দের পটভূমি

বাংলা ছন্দের পেছনে ভারতীয় সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। সংস্কৃত কাব্যে পাদ, অক্ষর, মাত্রা, লঘু-গুরু, যতি, গণ, বৃত্ত– এসব ধারণা সুসংহত ছিল। বাল্মীকির শ্লোক-উৎপত্তির কাহিনি ভারতীয় ছন্দ-ভাবনার এক মহৎ সাংকেতিক সূত্র। কাহিনিটি এমন– বাল্মীকি একদিন তমসা নদীর তীরে ক্রৌঞ্চপাখির মিথুন জুটির একটি পাখিকে ব্যাধের তীরে নিহত হতে দেখে শোকাহত হন। সেই শোক থেকেই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় শ্লোক–

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।"

পরে তিনি উপলব্ধি করেন, শোকবিদ্ধ উচ্চারণটি পদবন্ধ, সমাক্ষর, লয়সমন্বিত– অতএব এর নাম হোক শ্লোক। এই কাহিনির তাৎপর্য

হলো: কবিতার ছন্দ জন্ম নেয় অনুভূতি, ধ্বনি ও বিন্যাসের মিলনে। শোক থেকে শ্লোক– এই রূপান্তর ছন্দের নন্দনতাত্ত্বিক জন্মকথা।[১৩] বাংলা ছন্দ সংস্কৃত ছন্দের সরাসরি অনুকরণ নয়; কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস, পাদবিভাগ, মাত্রাবোধ ও কাব্যিক পরিমিতি বাংলা কবিতার প্রাচীন ছন্দচিন্তায় প্রভাব রেখেছে। বাংলা ভাষার ধ্বনি– প্রকৃতি সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ-হ্রস্বনির্ভর নয়; তাই বাংলা ছন্দ নিজস্ব নিয়মে বিকশিত হয়েছে। এই বিকাশের প্রথম বড় নিদর্শন দেখা যায় চর্যাপদে।

চর্যাপদে বাংলা ছন্দের প্রাচীনতম রূপ

চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। এর ভাষা প্রাচীন, রূপ গূঢ়, ভাব বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু ছন্দের দিক থেকেও চর্যাপদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাগীতিগুলো গানধর্মী, তাই এগুলোর ধ্বনি ও লয়ের সংগঠন স্বাভাবিকভাবেই ছন্দময়। প্রাচীন বাংলা ছন্দের এক প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য চর্যাপদে দেখা যায়–চরণভিত্তিক বিন্যাস, দোলাযুক্ত উচ্চারণ, সংগীত–প্রকৃতি এবং মাত্রাধর্মী প্রবণতা। অনেক চর্যায় সংস্কৃত ‘পাদাকুলক’ জাতীয় ছন্দরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায় বলে ছন্দগবেষকরা মত দিয়েছেন। আপনার দেওয়া নোটেও বলা হয়েছে, অধিকাংশ চর্যাপদের মধ্যে ষোলোমাত্রিক পাদাকুলক জাতীয় ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[১৪]

উদাহরণ:

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমনা ভইলা॥

১৩.

১৪.

এখানে ভাষা প্রাচীন হলেও ধ্বনিগত দোলা স্পষ্ট। চরণের শেষে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ির ব্যবহার পদশেষ ও ভাবশেষ বোঝায়। আধুনিক কমা, সেমিকোলন, প্রশ্নচিহ্ন ইত্যাদি তখন ছিলনা; কিন্তু চরণবিভাগ ও উচ্চারণ– বিরতির মধ্যেই ছন্দের গঠন প্রকাশিত।

চর্যাপদের ছন্দ-প্রকৃতি বোঝার জন্য নিচের ছকটি দেখা যায়–

চর্যাপদ
- গানধর্মী পদ
- ধ্বনি ও লয়ের পুনরাবৃত্তি
- চরণভিত্তিক বিন্যাস
- পাদাকুলক ছন্দের প্রভাব
- সাধনামূলক গূঢ়ার্থ
- প্রাচীন বাংলা ছন্দের প্রাথমিক রূপ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মধ্যযুগীয় ছন্দধারা

চর্যাপদের পর বাংলা ভাষায় মধ্যযুগীয় পদ্যসাহিত্যের শক্তিশালী ধারা গড়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, অনুবাদসাহিত্য, পুঁথি ও লোককাব্যে বাংলা ছন্দ আরও সুস্পষ্ট রূপ পায়। এই সময় বাংলা কবিতার প্রধান বাহন ছিল গীতিধর্মিতা ও শ্রুতিপ্রধানতা। কবিতা শুধু পড়ার জন্য নয়; গাওয়ার, শোনার, আবৃত্তির এবং পুঁথিপাঠের জন্য রচিত হতো।

চিরদিন মথুরাক না জাহাল ----- ৬+৬
কেহে নাই কর দহী ------৮
গোআল জরম আক্ষোগুণ-----৬+৪
দধি দুধে উপপতী -------৮
এবে তাক উপেখহ কেহে-----৮
তোর ভৈল কি কুমতী------৮

এখানে মাত্রা ও চরণসমতা আধুনিক অর্থে সবসময় কঠোর নয়, কিন্তু গীতিময়তা ও উচ্চারণগত লয় ছন্দকে ধরে রাখে। মধ্যযুগীয় বাংলা পদ্যের শক্তি এখানেই– এটি কাগুজে মাপের চেয়ে শ্রুতির দোলায় বেশি নির্ভরশীল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের তিন ধারা: পয়ার, লাচাড়ি ও ধামালি

প্রবোধচন্দ্র সেনের আলোচনায় প্রাচীন বাংলা ছন্দধারাকে প্রধানত তিন ভাগে দেখা যায়–

১. পয়ার, ২. লাচাড়ি, ৩. ধামালি

এই তিনটি ধারা বাংলা ছন্দের লোকভিত্তি, কাব্যভিত্তি ও গীতিভিত্তিকে বুঝতে সাহায্য করে।

১. পয়ার: পয়ার বাংলা ছন্দের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী রূপগুলোর একটি। পয়ার শব্দটির সঙ্গে 'পদ' শব্দের সম্পর্ক ধরা হয়। পদ মানে পা বা মাপা চলন। পয়ারে চরণ মাপা, মাত্রা নির্দিষ্ট এবং অন্ত্যমিলযুক্ত। সাধারণভাবে পয়ার বলতে ১৪ মাত্রাবিশিষ্ট সমিল চরণ বোঝানা হয়। তবে পয়ারের রূপ একরকম নয়; এর মধ্যে খর্ব পয়ার, মধ্য পয়ার, দীর্ঘ পয়ার, মহাপয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি রূপের আলোচনা পাওয়া যায়। পয়ারের প্রচলিত বিন্যাস– ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রা

ধারণাচিত্র

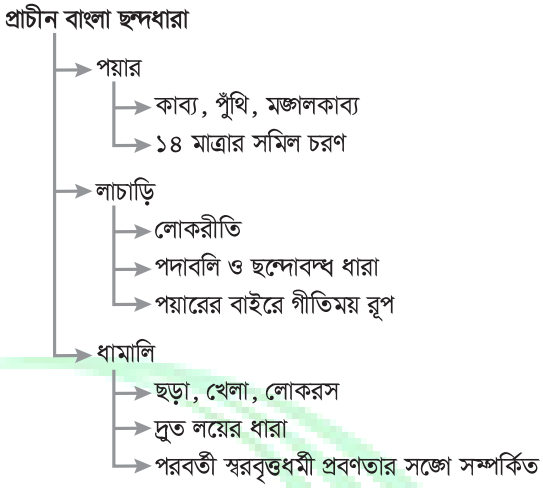

উদাহরণ:

মহাভারতের কথা/অমৃত সমান ৮ + ৬
কাশীরাম দাস ভনে/শোনে পুণ্যবান ॥ ৮ + ৬

এই উদাহরণে চরণে ৮ মাত্রার পর একটি যতি, তারপর ৬ মাত্রার পর পূর্ণযতি। এই ৮+৬ ভাগ পয়ারের সহজ ও প্রভাবশালী দোলা তৈরি করে।

পয়ারের বৈশিষ্ট্য:

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
মাত্রা	সাধারণত ১৪ মাত্রা
বিভাজন	অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৮+৬
মিল	সাধারণত অন্ত্যমিল থাকে
ব্যবহার	মঙ্গালকাব্য, পুঁথি, আখ্যানকাব্য

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
ভাষা	সাধুভাষা ও মধ্যযুগীয় পদরীতি
গতি	মধ্য বা ধীরগতি
শক্তি	দীর্ঘ আখ্যান বহনক্ষমতা

পয়ারের সবচেয়ে বড়ো শক্তি হলো আখ্যান বহনের ক্ষমতা। মঙ্গালকাব্য, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি আখ্যানধর্মী সাহিত্যে পয়ারের সাফল্য এই কারণে।

পয়ারের ধরন: পয়ারের ভেতরেও ভিন্নতা দেখা যায়–

এখানে 'খর্ব', 'মধ্য' ও 'দীর্ঘ' রূপগুলো চরণের দৈর্ঘ্য, মাত্রাবিভাগ ও ব্যবহারগত ভিন্নতার সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপদী ও চৌপদী পদসংখ্যা বা চরণবিন্যাসের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো তৃতীয় পর্বে ছন্দবিশ্লেষণের সময় উদাহরণসহ আরও স্পষ্ট করা যাবে।

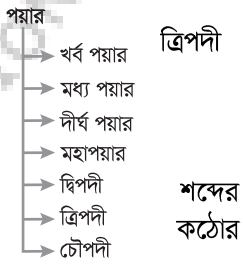

২. লাচাড়ি: লাচাড়ি পয়ারের মতো সরল ১৪ মাত্রার সমিল ছন্দ নয়; এটি বাংলা লোকরীতি ও গীতিময় ছন্দধারার সঙ্গে যুক্ত। চৈতন্য-পূর্ব যুগে গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণ কাব্যে পয়ারের পাশাপাশি 'লাচাড়ি' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় বলে ছন্দগবেষকরা উলেখ করেছেন। লাচাড়ি মূলত এমন ছন্দবন্ধ রীতি, যেখানে পয়ারের কঠোর মাত্রাবিন্যাসের বাইরে গীতির সহজ ভঙ্গি কাজ করে।

লাচাড়ির বৈশিষ্ট্য–

বৈশিষ্ট্য	ব্যাখ্যা
প্রকৃতি	ছন্দবন্ধ লোকরীতি।
পয়ার থেকে পার্থক্য	১৪ মাত্রার কঠোর পয়ার নয়।
ব্যবহার	পদাবলি, লোকধর্মী কাব্য, গীতিময় রচনা।
গতি	তুলনামূলক মুক্ত ও গীতিশ্রুত।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব	পয়ারের বাইরে বাংলা ছন্দের অন্য প্রবাহের প্রমাণ।

লাচাড়ির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলা ছন্দকে শুধু পয়ারে সীমাবন্ধ করলে লোকধর্মী গীতিকবিতার স্বাভাবিক ছন্দচলন বোঝা যায়

না। লাচাড়ি দেখায়, বাংলা ছন্দের একদিকে আছে মাপা আখ্যানধর্মী পয়ার, অন্যদিকে আছে মুক্ততর গীতিধর্মী প্রবাহ।

ধামালি

ধামালি প্রকৃতপক্ষে ছন্দের কঠোর জাতিগত নাম নয়; বরং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিশেষ রচনাধারা বা লোকরসাত্মক ছন্দচলন। শিশুদের ছড়া, খেলার সময়ের হাস্যরসাত্মক পদ, লোকসংগীতধর্মী উচ্চারণে ধামালির স্বরূপ ধরা পড়ে। এর দ্রুতলয়, শ্বাসাঘাত, পুনরাবৃত্তি এবং সহজ মুখস্থযোগ্যতার সম্পর্ক আছে।

ধামালি
- লোকরসাত্মক
- ছড়া–খেলা–গানসংলগ্ন
- দ্রুতলয়ী
- মুখে মুখে প্রচলিত
- সহজ পুনরাবৃত্তিময়
- স্বরবৃত্তধর্মী প্রবণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

ধামালির বৈশিষ্ট্য:

ধামালি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বাংলা ছন্দ শুধু পুঁথি ও কাব্যের নয়; এটি লোকজীবন, শিশুভাষা, গান, খেলা, আচার, সমবেত উচ্চারণ ও দেহগত তালের সঙ্গেও যুক্ত।

বাংলা ছন্দের শ্রেণি বিভাগ

আধুনিক বাংলা ছন্দতত্ত্বে ছন্দকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়–

১. অক্ষরবৃত্ত, ২. স্বরবৃত্ত ও ৩. মাত্রাবৃত্ত।

তবে নামকরণে ভিন্নতা আছে। বিভিন্ন ছান্দসিক বিভিন্ন নামে এগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন–

নামবৈচিত্র্যের সারণি

ছান্দসিক	অক্ষরবৃত্ত	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত
কালিদাস রায়	অক্ষরবৃত্ত	স্বরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত
তারাপদ ভট্টাচার্য	অক্ষরবৃত্ত	বলবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত
সুধীভূষণ ভট্টাচার্য	ভঙ্গা প্রাকৃত	দেশজ	শুদ্ধ প্রাকৃত
সুকুমার সেন	তদব তানপ্রধান	অর্ধ-তৎসম তালপ্রধান	তৎসম টানপ্রধান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সমমাত্রার ছন্দ	বিষমমাত্রার ছন্দ	অসমমাত্রার ছন্দ
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	আদ্যা	চিত্রা/দৃপ্তা/মঞ্জু	হৃদ্যা
প্রবোধচন্দ্র সেন	অক্ষরবৃত্ত/মিশ্রবৃত্ত	স্বরবৃত্ত/দলবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত/কলাবৃত্ত
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	তানপ্রধান ধীরলয়	শ্বাসাঘাতপ্রধান দ্রুতলয়	ধ্বনিপ্রধান বিলম্বিত লয়

এই সারণি থেকে বোঝা যায়, বাংলা ছন্দের মূল তিন রূপ একই থাকলেও তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নাম ও ব্যাখ্যায় ভিন্নতা এসেছে। কেউ গণনার ভিত্তি ধরে নাম দিয়েছেন, কেউ লয় ধরে, কেউ ভাষাগত উৎস ধরে, কেউ ধ্বনি বা তানের প্রকৃতি ধরে।

তিন প্রধান ছন্দের তুলনামূলক ধারণা

ছন্দ	গণনার ভিত্তি	রুদ্ধদলের ভূমিকা	লয়	সাধারণ ব্যবহার
অক্ষরবৃত্ত	অক্ষর/দল ও বিশেষ মাত্রানীতি	পদান্তে রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক।	ধীর/মধ্য	আখ্যান, পয়ার, ক্লাসিক কাব্য
স্বরবৃত্ত	দল/স্বরসংখ্যা	মুক্ত ও রুদ্ধ উভয়ই একমাত্রিক।	দ্রুত	ছড়া, লোককবিতা, শিশুকবিতা
মাত্রাবৃত্ত	মাত্রা	রুদ্ধদল সাধারণত দ্বিমাত্রিক।	মধ্য/বিলম্বিত	গীতিময় ও ললিত কবিতা